শেষ চিঠি
কুন্তল চক্রবর্তী

শেষ-চিঠি

০২/০৫/২০২৬

কুন্তল চক্রবর্তী

সকাল থেকেই আকাশে মেঘেরা সূর্যের সাথে ঝগড়া করে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে সমগ্র আকাশ আচ্ছাদিত করে রেখেছে, দেখেই মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই অশ্রু-রূপী বর্ষণ-ধারা বর্ষিত হবে। আমি আমার ৫৮/১ কাঁকুড়গাছি দ্বিতীয় লেনের বাড়ির বারান্দায় বসে ব্ল্যাক কফি পান করছি, এমন সময় আমার অন্যতম পরম মিত্র সপ্তর্ষি এসে ঘরে ঢুকলো।

আমাদের মধ্যে স্বাভাবিক আলোচনা চলছে, এমন সময় হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল এবং আগন্তুকের করা ফোনকলটা কেটেগেল। ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলাম একটা অজানা নাম্বার, ঘুরিয়ে ফোন করতে যাব এমন সময় আবার সেই আগন্তুক ফোন করলেন। ফোনটা ধরা মাত্রই উল্টোপ্রান্তের ব্যক্তি, থুরি মহিলা উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি কৃষ্ণচরণ-বাবুর সাথে কথা বলছি? আমি উত্তরে হ্যাঁ বলতেই তিনি যা বললেন তা অনেকটা এই রকম - "আজ থেকে প্রায় মাস খানেক আগে সূর্যদীপ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে আমায় ফোন করা আগন্তুক মহিলা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন, তার পর থেকে সব স্বাভাবিক নিয়মে চললেও বিগত দুই-তিন দিন ধরে তার আর কোনো খোঁজ সে পায় না, একটি খাম বন্দি ফাঁকা কাগজ ছাড়া" । তার সম্পূর্ণ বক্তব্য শুনে আমি তাকে বললাম, আপনি চিন্তা করবেন না, আমি চেষ্টা করব সৌর্যদীপকে খুঁজে বের করার।

তাকে এই সান্তনা বানি দিয়ে ফোন পেছনে ঘুরে দেখি সপ্তর্ষির সম্পূর্ণ বিষয়টা জানবার ঔৎসুক্য চাপতে না পারায় সে এক বীভৎস অবস্থা, আমি তাকেই লক্ষ্য করে তাকিয়ে আছি অনুভব করে সে আমাতা আমতা করে বলে উঠল, আজ তাহলে আশী বুঝলি, বুঝতেই পারছি কিছুক্ষণের মধ্যে তুই বেরোবি। আমি তার পরিহিত পোশাকের স্থিতিস্থাপকতাটুকু রক্ষা করে টেনে বসিয়ে বললাম, তোকে আমি কি বলেছি, আমি এখনি বেরোব? যিনি ফোন করেছিলেন তিনি এখানে আসছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। প্রায় এক-ঘণ্টা পরে ঘরে যিনি প্রবেশ করলেন তিনি কোনো মহিলা নন, এক বছর পঁয়ত্রিশেকের সুন্দরী যুবতী, নাম মেঘমালা রায়। তিনি বাড়িতে ঢোকার প্রায় সাথে সাথেই মুষলধারায় বৃষ্টি নামলো। প্রায় বাড়িকাপানো ডাকাডাকি করে আধকালা দিপুকে ডেকে আমাদের জন্য চা আনতে বলে গম্ভীর আলোচনায় বসলাম, ফোনে শোনা বক্তব্যের আরও বিস্তারিত রূপ আহরণ করার চেষ্টা করছি, এমন সময় হঠাৎ অস্থায়ী সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই বিপত্তি বাঁধল। আমি দিপুকে বলতে যাবো একটা মোমবাতি আনার কথা, এমন সময় দেখি সে নিজেই চায়ের সঙ্গে একটি মোমবাতি ধরিয়ে এনেছে। এর পর নির বিঘ্নেই চলল আলোচনা, বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ বৃষ্টি একটু ধরে এলে মেঘমালা বিদায় নিলেন, ঘরের মধ্যে রইলো বুদ্ধিতে উন্নত দুটি প্রাণী আর রঙিন খামে ভরা শ্বেত-শূন্য কাগজ। তখন মোমবাতির আলো নিভু-নিভু, প্রায় নিভতে বসা অগ্নিশিখা দেওয়ালে রচিত ছায়ার যাত্রাপালার আলোক উৎসে পরিনত হয়েছে, এমন সময় সপ্তর্ষি এই দীর্ঘ চিন্তার মনসংযোগজাল ছিন্ন করে

জিজ্ঞাসা করলো,“ আচ্ছা তোর কি মনে হয়, এই সাদা কাগজের মানে কি হতে পারে?” আমি উত্তরে বললাম,“হতে পারে এটা কোনো প্রমাণ বা শুধুই একটা চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা, তার হয়তো মেঘমালার ওপর আর মনে টিকছেনা কিংবা অন্য কোনো ব্যাপার।” যাই হোক সেটা আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে, আমার এই উত্তর মনে হয় ওর মনঃপূত হলোনা, তাই “আজ আসি অনেক দেরি হয়েগেলো” -বলে গুটি গুটি পায়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। দুপুরের পর বিদ্যুৎ এলো, তারপর একাজ সেকাজ করে খামের কথা মনে নেই, রাতে যখন ঘুমোতে যাব তখন ঘটলো ঘটনাটা, রাত পায় দশটা নাগাদ রাতের খাওয়া শেষ করে ঘরে এসে খাম থেকে কাগজটা বের করে অনেক ভাবে পরীক্ষা করেও কিছু না পেয়ে অব শেষে খামের মধ্যে কাগজটি ঢুকিয়ে, বেপরোয়া ভাবে টেবিলের ওপর রেখে লাইট নিভিয়ে শুতে যাব এমন সময় লক্ষ্য করলাম একটা ক্ষীণ সবুজ আলো হঠাৎ আলো টেবিলের বিপরীতে রাখা আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে। আলোটা যে টেবিল থেকে আসছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু বস্তুটা কি সেটাই বিষয়। আমি আবার ফিরে গেলাম সুইচ বোর্ডের কাছে, আবার জ্বালালাম লাইট, কোথায় কি? টেবিলের ওপর খাম ছাড়া কিচ্ছু নেই, আমি মনের ভুল ভেবে আবার লাইট বন্ধ করে দিলাম। সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি, এবার হঠাৎ আমার মাথায় একটা দুর্ঘটনার প্রসঙ্গে রেডিয়ামের কথা উদয় হতেই লাইট জ্বালিয়ে খাম থেকে চিঠি বার করে লাইট বন্ধ করে চিঠি পড়ার চেষ্টা করতে লাগলাম। চেষ্টা সফল হলো, পরিষ্কার শুদ্ধ বাংলায় লেখা, তবে এ প্রেমবার্তা না, কোনো কিছুর সম্পর্কে গোপন ও সূক্ষ তথ্য, সেটা পরের কথা, তার আগে জানা দরকার সৌর্যদীপের কাছে রেডিয়াম কি করে এলো? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য পর দিন সকালে মেঘমালা দেবীকে ফোন করে সে বিষয়ে জানতে চাইলে মেঘমালা দেবী ফোনের ওপার থেকে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন। তারপর মৃদু স্বরে বললেন– “আমি জানতাম না এই কথাটা আপনাকে বলব কি না। সূর্যদীপ রসায়ন নিয়ে গবেষণা করত। ওর নিজের একটা ছোট ল্যাবরেটরি ছিল। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, অদৃশ্য কালি, বিশেষ আলোক-সংবেদনশীল রাসায়নিক–এসব নিয়ে ওর খুব আগ্রহ ছিল। প্রায়ই বলত, ‘যে তথ্য সবার চোখে পড়বে, সেটা তথ্য নয়; তথ্য তখনই নিরাপদ, যখন তা দেখতে জানে শুধু একজন।”

আমি আর প্রশ্ন বাড়ালাম না। শুধু জানতে চাইলাম–

“সূর্যদীপের কোনো শত্রু ছিল?”

“ছিল কি না জানি না,” মেঘমালা বললেন, “তবে মৃত্যুঞ্জয় সেন নামে একজন ব্যবসায়ী প্রায়ই ওর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। শেষ কয়েকদিন ওকে নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল।” ফোন কেটে আমি আবার সেই চিঠির দিকে মন দিলাম। সবুজ আলোয় লেখা অক্ষরগুলো এবার স্পষ্ট দেখা গেল–

“আমাকে খুঁজতে গেলে মানুষকে নয়, ছায়াকে অনুসরণ করবেন। ২৪শে জুন, দুপুর ১২টা। পুরোনো শঙ্খ কারখানা। দক্ষিণ দেওয়ালের তৃতীয় ইট। বিশ্বাস করবেন না–যে নিজেকে বন্ধু বলে পরিচয় দেয়।”

শেষ লাইনটি আমার মনে অদ্ভুত এক শীতল স্রোত বইয়ে দিল, "বিশ্বাস করবেন না–যে নিজেকে বন্ধু বলে পরিচয় দেয়," সপ্তর্ষির কথা হঠাৎ মনে পড়ল। কিন্তু না, এত সহজে কাউকে সন্দেহ করা যায় না। পরদিন আমি আর সপ্তর্ষি রওনা দিলাম শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত বহুদিনের পরিত্যক্ত শঙ্খ কারখানার উদ্দেশ্যে। জায়গাটিতে পৌঁছেই বুঝলাম, বহু বছর ধরে সেখানে মানুষের পা পড়েনি। ভাঙা জানালা, শেওলা ধরা দেওয়াল আর বৃষ্টির জলে ভেজা মেঝে জায়গাটিকে এক বিভীষিকাময় পরিবেশ দিয়েছে। দক্ষিণ দেওয়ালের তৃতীয় ইটটি খুলতেই একটি ছোট্ট লোহার বাক্স বেরিয়ে এল।

ঠিক সেই মুহূর্তে– “ওটা আমাকে দিন, কৃষ্ণচরণবাবু।” পেছন থেকে ভেসে এল একটি কণ্ঠস্বর। ঘুরে দেখি মৃত্যুঞ্জয় সেন, তার হাতে রিভলভার, তিনি হেসে বললেন, “সূর্যদীপ অনেক বেশি জেনে ফেলেছিল। ওর আবিষ্কার কোটি টাকার। অদৃশ্য তথ্য সংরক্ষণের এই পদ্ধতি যদি বিদেশে বিক্রি করা যায়, তাহলে আমি রাতারাতি ধনী হয়ে যাব। কিন্তু ও রাজি হয়নি।” আমি সময় নষ্ট না করে কথায় কথায় তাঁকে ব্যস্ত রাখলাম, এদিকে সপ্তর্ষি নিঃশব্দে পাশে সরে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটি ইট গড়িয়ে পড়তেই মৃত্যুঞ্জয়ের দৃষ্টি সেদিকে গেল, সেই সুযোগে সপ্তর্ষি ঝাঁপিয়ে পড়ল। ধস্তাধস্তির মাঝে গুলির শব্দে গোটা কারখানা কেঁপে উঠল। আমি মৃত্যুঞ্জয়ের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিলাম। ঠিক তখনই পুলিশের সাইরেন শোনা গেল, আমি আগেই চিঠির তথ্য অনুযায়ী থানায় খবর পাঠিয়েছিলাম। মৃত্যুঞ্জয় সেন গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু রহস্য তখনও শেষ হয়নি, লোহার বাক্স খুলে আমরা যা পেলাম, তা দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। ভেতরে ছিল কয়েকটি গবেষণাপত্র, একটি পেনড্রাইভ এবং একটি ডায়েরি। ডায়েরির শেষ পাতায় সূর্যদীপ লিখেছিল– “যদি এই ডায়েরি কেউ পড়ে, তবে বুঝবে আমি হয়তো আর বেঁচে নেই। আমি নিজের ইচ্ছায় আত্মগোপন করছি। আমার গবেষণাকে যারা হাতিয়ে নিতে চায়, তারা আমাকে হত্যা করতেও দ্বিধা করবে না। কৃষ্ণচরণবাবুর নাম আমি শুনেছি। তিনিই পারবেন সত্যিটা প্রকাশ করতে।” এর নিচে আরেকটি লাইন– “আমাকে খুঁজবেন না। যখন নিরাপদ হব, আমি নিজেই ফিরে আসব।”

প্রায় তিন মাস পরে এক বর্ষার সন্ধ্যায় আমি বারান্দায় বসে কফি খাচ্ছি, হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ, দরজা খুলতেই দেখি একজন রোগা, দাড়িওয়ালা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে,চোখ দুটো অদ্ভুত শান্ত, তিনি মৃদু হেসে বললেন– “আমি সূর্যদীপ।”

আমি কিছু বলার আগেই তিনি টেবিলের ওপর একটি নতুন রঙিন খাম রেখে চলে গেলেন।

আমি তাড়াতাড়ি খামটি খুললাম, ভেতরে আবারও একটি সম্পূর্ণ সাদা কাগজ, অভ্যাসবশত ঘরের আলো নিভিয়ে দিলাম, এইবার কাগজে সবুজ আলোয় মাত্র একটি বাক্য ফুটে উঠল–

> "প্রথম রহস্যের সমাপ্তি। দ্বিতীয় রহস্যের সূচনা–শূন্য কক্ষের মানুষগুলো অপেক্ষা করছে..."

বাইরে তখন আবার মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। দূরে কোথাও বজ্রপাতের আলোয় জানলার কাচে এক মুহূর্তের জন্য যেন কয়েকটি মানুষের ছায়া দেখা গেল। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো, ডায়রি পড়ার পর মেঘমালার বলা কথাটা, "কৃষ্ণ চরণ বাবু, ওর লেখা শেষ চিঠিটা আমাকে দেবন? দিলে ওর শেষ স্মৃতি টুকু নিয়ে আমি আমার এই অনিশ্চিত অনন্ত পথে আলো জ্বালিয়ে এগিয়ে যেতে পারব। ওই চিঠিটাই ওর শেষ স্মৃতি আমার কাছে।" পরের মুহূর্তেই তারা মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

সমাপ্ত... নাকি নতুন রহস্যের শুরু?

Other books written by Kuntal Chakraborty

- History Of World(11.12.2020 and 2021-2023)[FirstVolume]
- পৃথিবীর ইতিহাস (11.12.2020and2021-2023)[প্রথম খণ্ড]
- সিরাজ দৌলার প্রতিশোধ (বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব) কুন্তল চক্রবর্তী
- কুয়াশার রেশম (লেখক- শ্রী কুন্তল চক্রবর্তী, প্রসাসক- দোলন-চাঁপা পত্রিকা)
- ভ্রমণ বৃতান্ত
- History Of World(11.12.2020 and 2021-2023)[Second Volume]
- পৃথিবীর ইতিহাস (11.12.2020and2021-2023)[দ্বিতীয় খণ্ড]